যাত্রানামা
সুদীপ দাশ

Copyright © 2020, Sudip Das
All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any information storage and retrieval system now known or to be invented, without permission in writing from the publisher, except by a reviewer who wishes to quote brief passages in connection with a review written for inclusion in a magazine, newspaper or broadcast.

Published in India by Prowess Publishing,
YRK Towers, Thadikara Swamy Koil St, Alandur,
Chennai, Tamil Nadu 600016

ISBN: 978-81-945278-8-6

Library of Congress Cataloging in Publication

বিষয়সূচী

ভ্রমণ

১. সেবার শীতে খৈরীর ডাকে ৩
২. গঙ্গা সাগরের দিনগুলি. ৬
৩. অথঃ জলদাপাড়া কথা ১৩
৪. বছর পঁচিশ ১৭

স্মৃতি কথন

৫. একটি যুগের নাম অংশুমান রায়. ২১
৬. একটি মৃত্যু ২৩
৭. বড়দিন–স্মৃতির আলোয়. ২৬
৮. হারিয়ে যাওয়া সেই ছেলেটি ২৮
৯. এ কি! এযে রক্ত?. ৩১
১০. হাফ টিকিট ৩৪
১১. আলোতে ছায়াতে দীপাবলি ৩৬

১২. এলো যে চাঁদার বেলা ৩৯
১৩. রাখে হরি ৪২
১৪. একুশে আইন ৪৪
১৫. মহাপ্রস্থানের পথচিত্র ৪৭
১৬. স্মৃতির ছেঁড়া পাতা থেকে–বইমেলা ৫০
১৭. হারিয়ে যাওয়া উলের গোলা ৫৫
১৮. কেহ কারো মন বোঝে না ৫৮

গল্প

১৯. তনয়দের অদ্ভুত বাড়ি ৬৩
২০. কল্প–কুসুম. ৬৬
২১. সংকট. ৭১
২২. মুক্তি. ৭৫
২৩. নও শুধু কবি ৮৪
২৪. ঠকবাজ ৯২
২৫. বেলাশেষের বোঝা ৯৭
২৬. যা হারিয়ে যায় ১০৩
২৭. লক্ষ্মীর পরীক্ষা ১০৮
২৮. অ্যান্টাসিড ১১১

২৯. রাবাংলার সূর্য ও না বলা কথা ১১৫
৩০. তকদির আপনা আপনা ১১৯
৩১. বিরিয়ানীর বিপদ. ১২৩
৩২ রঞ্জন আসবেই ১২৬
৩৩. যাত্রানামা. ১৩২
৩৪. সিদ্ধি–ধাত্রী ১৩৭
৩৫. জীবনে যত পূজা হল না সারা ১৪৩

১. সেবার শীতে খৈরীর ডাকে

১৯৭৫–৭৬ সাল। ওড়িশার সিমলিপাল অরণ্যের টাইগার প্রোজেক্টের প্রধান ছিলেন সরোজরাজ চৌধুরী। উনি আর ওর বোন নীহার দেবীর আদরে একটি ব্যাঘ্র শাবক যোশীপুর ফরেস্ট বীটে বড় হচ্ছিল, নাম তার খৈরী। সেই সময় কলকাতায় আমরা ইস্কুলে বোধ হয় সেভেনে বা এইটে পড়ি। প্রতি মাসে ‘আনন্দ মেলা’ পত্রিকার জন্য আমরা অপেক্ষা করে থাকতাম। সেই পত্রিকায় খৈরীকে নিয়ে নিয়মিত ফীচার খুবই আকর্ষনীয় হয়েছিল।

বাড়িতে এক শীতের বড়দিনের ছুটিতে বাবা এসে ঘোষণা করলেন যে, এ বার আমরা খৈরীর জঙ্গলে বেড়াতে যাব। আমি, মা বাবা আর বাবার দুই বন্ধু একদিন ভোরে বেরিয়ে পড়লাম বাংরিপোশীর উদ্দেশে। ধর্মতলা থেকে ওড়িশার কেঁওঞ্ঝর যাবার বাসে চেপে আমরা প্রথমে বাংরিপোশী নামলাম দুপুরে। সিমলিপাল জঙ্গলের শুরু তে এই অখ্যাত গ্রাম বাংরিপোশী। এখান থেকে মিটার গেজ লাইন ছিল বারিপদা পর্যন্ত। ময়ূরভঞ্জ এক্সপ্রেস বলে ছোট বেশ খেলনার মতো একটা রেলগাড়ী চলত। একটিই গাড়ি, সকাল যাওয়া আর সন্ধ্যায় ফেরা। ওখান থেকে বুড়িবালাম নদী, যেখানে বাঘাযতীন স্বাধীনতা সংগ্রামের এনকাউন্টারে শহীদ হয়ে ছিলেন আর ঠাকুরানী পাহাড় ঘুরে দেখা হল।

এবার আমাদের আসল গন্তব্য যোশীপুর ফরেস্ট, যেখানে মানুষ মায়ের আদরে বেড়ে উঠছে খৈরী। আমরা বাংরিপোশী থেকে আবার যোশীপুর যাওয়ার বাসে চড়লাম একদিন সকালে। খুব দূর নয়, ঘন্টাখনেক এর মধ্যে পৌছে গেলাম। যোশীপুরে থাকার কোন রকম ব্যাবস্থা ছিল না। তাই ফরেস্টের উল্টো দিকে একটি ধাবা ছিল পাঞ্জাবী। আমরা ওখানেই খাওয়া দাওয়া করেছিলাম। খুব মজা লেগেছিল যখন দেখেছিলাম যে এক মহিলা, ধাবার মালিকের স্ত্রী হবেন গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিলেন।

যাই হোক, আমরা এবার আমাদের আসল প্রাপ্তির অপেক্ষায়। ফরেস্টের গেট দিয়ে ঢুকে বাবা আর কাকুরা সব ব্যাবস্থা করলেন খৈরীকে দেখার। আমি তো অত্যন্ত উত্তেজিত। আমাদের জঙ্গলের অনেকটা ভিতরের দিকে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে দূর থেকে দেখলাম একটি বড় বাঘ বসে আছে সঙ্গে একটি হায়না, ওর সঙ্গী। একটু দূরে একজন বন্দুকধারী প্রহরী রয়েছেন সাবধানতা রক্ষায়। আমাদের. মতো কয়েকজন অতি উৎসাহীর অনুরোধে খৈরীর আরও কাছাকাছি যাওয়ার অনুমোদন মিলল। কিন্তু যেহেতু আমি একটি উজ্জ্বল লাল রঙা সোয়েটার পরেছিলাম তাই আমাকে বলা হল ঢুকতে দেওয়া হবে না। আমি তো কান্নাকাটি জুড়ে দিলাম। তখন বলা হোল ঠিক আছে তবে ওই লাল রঙা সোয়েটার খুলে যেতে হবে। মজা হল খৈরী নাকি বাচ্চাদের উজ্জ্বল রঙা পোশাক দেখে খেলতে আসে। যদিও খুব ঠান্ডা, তবু আমি সোয়েটার খুলেই ওই ঘেরা জায়গায় ঢুকেছিলাম। অনেক ছবি তুলে ছিল কাকুরা। আমরা মিনিট দশেকে ওখানে ছিলাম।। আহা কি সুন্দর বাঘটির চেহারা। গায়ের একটা গন্দ্ধ তো ছিলই। প্রতি মাসের আনন্দ মেলা পত্রিকার বিবরণের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া। খৈরী বেশ শান্ত ভাবে রোদ পোহাচ্ছিল। আর ওর সঙ্গী হায়না টি ওর সঙ্গে খুনসুটি করছিল মনে আছে। তারপর আমরা সরোজরাজ চৌধুরী বাবুর সঙ্গে দেখা করি। আমাদের কত কৌতুহল, এই মুহুর্তে আর মনে আসছে না।। বাবা, মা কাকু দের কত রকমের প্রশ্নের উত্তর দিলেন সরোজবাবু। তখনকার দিনের একটি বিখ্যাত সিনেমা ছিল. 'বর্ন ফ্রী', যেখানে এলসা নামে সিংহীশাবক মানুষের কাছে লালিত পালিত হয়েছিল। আমরা সেই রকম একটি ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকলাম।

আজ এতদিন পর শীতের বেড়ানোর এই অভিজ্ঞতা টি মনে পড়ল। সেবার আমরা বাংরিপোশী হয়ে আবার ফিরে এসেছিলাম। তারপর কিছু দিন ইস্কুলে বন্দ্ধু দের কত ভাবে যে গল্প করছিলাম সেই অভিজ্ঞতার কথা তা আজ ভাবলে বেশ মজা হয়।

খৈরীর মৃত্যু হয় ১৯৮১ সালে, রাবিস্ হয়ে। তারপর সরোজবাবুও সেই বছরই গত হন।

আজও আমি সেই লাল রঙা সোয়েটারটা রেখে দিয়েছি আলমারীর কোণে। শীতের সময় ওই সোয়েটার টিতে চোখ পড়লেই কেন যেন সেই খৈরীর জন্য মনটা আনচান করে ওঠে আজও॥

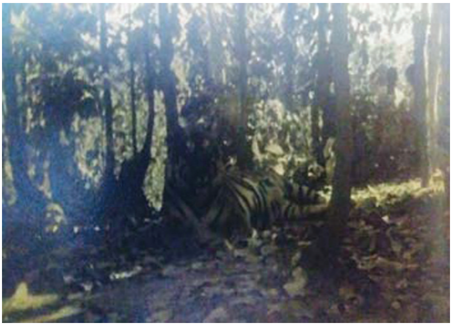

২. গঙ্গা সাগরের দিনগুলি

গঙ্গা সাগরে পাড়ি দেওয়ার ইচ্ছে আমার বহুদিনের। হঠাৎ একটা সুযোগ এসে গেল ১৯৮৬ সালের মকর সংক্রান্তির সময়। বি কম পরীক্ষা দিয়ে লম্বা ছুটি, তখন একটু কি করি করি ভাব। আমার এক জামাই বাবু ছিলেন রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের পদস্থ কর্মচারী। ওর ওপর দায়িত্ব ছিল দপ্তরের অ্যাডভান্স টীম নিয়ে গঙ্গা সাগরের যাওয়ার। আমিও সেই সুযোগে ল্যাংবোট হয়ে ঝুলে পড়লাম। তবে কঠিন সে যাত্রা। কেননা যেতে হবে ২রা জানুয়ারী। থাকতেও হবে দিন পনের। আমার অনেক শুভাকাঙ্খী ভয় দেখালো যে খুব ঠান্ডা লাগবে, ব্যাবস্থাও ভালো না। খাট নেই, পালঙ্ক নেই। তখন আমার শয়নে, স্বপনে জাগরনে শুধু একই কথা—“যাইব সাগরে”।

কথায় আছে, “সব তীর্থ বার বার, গঙ্গাসাগর একবার।”

যথাসময়ে রওনা দেওয়া হল। প্রথমে আমাদের গন্তব্য ২৪ পরগনার দক্ষিণ স্বাস্থ্য দপ্তরের অফিসে, তারপর সেখানে থেকে অ্যাডভান্স টীমের সবার সঙ্গে একটি ‘উইলিস’ জীপ গাড়িতে চড়ে পৌছলাম সাগরদ্বীপের এপারের ভূখন্ড ডায়মন্ডহারবার। সেখানের হারউড পয়েন্ট থেকে আমাদের ওপারে যেতে হবে। তার আগে আরেকটি জীপ আমাদের দলে যোগ দিল। আমরা জনা আটেক অ্যাডভান্স টীমের সদস্য। হরেক রকমের দপ্তরের সরঞ্জাম নিয়ে আমাদের যেতে হবে। আবার পনের ষোলদিনের থাকার খাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র। বিকেলের পড়ন্ত আলোয়, এক মায়াময় পরিবেশে আমরা হারউড পয়েন্ট থেকে ডিপার্টমেন্ট এর নিজস্ব লঞ্চে উঠলাম। তা আধা ঘন্টাটাক হবে, আমরা ওপারে পৌছলাম সাগরদ্বীপের কচুবেড়িয়া লঞ্চঘাটে। ওপারে যে এত বড় ভূখন্ড ছিল কে জানত। আবার সেখানের থেকে অন্য জীপে চড়ে পৌছলাম সাগরদ্বীপের মেলা প্রাঙ্গনে। তখন প্রায় সন্ধ্যে, আমরা বিশাল এক ধূ ধূ বালির মাঠে র সামনে

এসে দাড়ালাম। তখন চারিদিকে হোগলা পাতায় মোড়া অস্থায়ী ক্যাম্প তৈরী হচ্ছে। স্বাস্থ্য, জন স্বাস্থ্য কারিগরী, বিদ্যুৎ প্রভৃতি কত যে দপ্তরের জন্য সংরক্ষিত জায়গা রয়েছে, কিন্তু সবই অস্থায়ী ক্যাম্প, অস্থায়ী হাসপাতাল, থানা, জেলখানা, সবই তৈরী হচ্ছে। আমরা প্রথমে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে কিছুক্ষণ ওদের সন্নাসীদের সঙ্গে কথা বলে, চা জল খাবার খেয়ে চললাম আমাদের দপ্তরের অ্যাডভান্স টীমের থাকার জায়গায়। বেশ দপ্তরের জন্য সংরক্ষিত পাঁচিল ঘেরা জায়গা, কিন্তু সবই অস্থায়ী, গোটা তিরিশ বেডসহ হাসপাতাল হোগলা ছাওয়া হাসপাতাল তৈরী চলছে জোরকদমে। আমি হেল্থ ডিপার্টমেন্ট এর একটা ভলান্টিয়ারের ব্যাজ পেয়ে আল্হাদিত হয়ে গেলাম। রাতের এই নির্জন মেলাপ্রান্তর যে ক দিন পরে অমন জনসমুদ্রের চেহারা নেবে, তা তো স্বপ্নেও ভাবিনি। ঠান্ডার কামড় সেই লঞ্চে চড়ার সময় থেকেই অনুভব করে ছিলাম, রাত বাড়াতে বেশ কনকনে শীতের কাঁপুনী।

অ্যাডভান্স টীমের থাকার খাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস আমরা নিয়ে এসেছি। আর রাত্রিবাসের জন্য সেই হোগলা ছাওয়া ডর্মিটরির মতো ব্যাবস্থা। মেঝেতে মোটা লেয়ারের খড় পাতা, তার ওপর একটি কম্বল পেতে চাদর চাপিয়ে শুতে হত। আমি তো মোজা, সোয়েটার সব রকম পরে ঘুমতে গেলাম। নীচ থেকে ঠান্ডা না লাগলেও উপর থেকেই আসল ঠান্ডার শির শির করে হাওয়া আসার অনুভব। আহা, প্রথম রাতের সে কি গা ছম্ ছম্ অবস্থা! লোক নেই, জন নেই, "'আমরা কয়েকজন সিপাহী শাসন করি জনহীন প্রান্তর"। বিস্তীর্ণ মেলা প্রাঙ্গন সমুদ্রতট পর্যন্ত বিস্তৃত। চারদিক থেকে চওড়া পীচ রাস্তা করা, উঁচু উঁচু লাইট পোস্টে লাইটের ব্যাবস্থা, সারি সারি হোগলা পাতায় মোড়া অস্থায়ী ভক্তদের জন্য তৈরী আবাস। মাঝে মাঝে টয়লেট, জলের লাইন, পানীয় জলের ট্যাঙ্ক, সে এক এলাহী কান্ড। রান্নাঘরে বেশ পিকনিকের মেজাজে রান্নার আয়োজন, প্রথম রাতে খিঁচুড়ী আর ডিমভাজা দিয়ে শুরু। পরদিন ভোর ভোর ঘুম ভাঙতেই লাফ দিয়ে উঠে পড়লাম। তখন অনেকেই গভীর ঘুমে। আমার সবসময় মনে হত যেন কোন দৃশ্যই আমার নজর এড়িয়ে না যায়। আমার একটা আগফা ক্যামেরয় ফিল্ম ভরে এনেছিলাম। ভোর টয়লেটে কাজ সেরেই বেরিয়ে পড়লাম ক্যামেরা নিয়ে। আগে গেলাম আধ কিলোমিটার দূরের সাগরবেলায়। তখন সূর্যদেব সবে উঠব উঠব করছেন। আহা! সাগরের সে কি রূপ! যদিও জলের রঙ কেমন যেন ঘোলা ঘোলা তবুও আকাশে সূর্যোদয়ের রঙের ছটা। বেশ কয়েকটা ছবি তোলা হল। এর পর গেলাম কপিলমুনির আশ্রমের দিকে। একটি খোলার মন্দিরে কপিলমুনি, ভগীরথ আর মা গঙ্গার মূর্তিতে লাল সিন্দুর লেপা, এই ভোরে আমার সঙ্গে আর কোন দর্শক নেই,

তাই কোন তৎপরতাও নেই। আবার এই মন্দিরের ঠিক পাশ থেকে শুরু হয়েছেন নাগা সাধুদের শিবির,। একটু রোদ উঠতেই সাধুরা যে যার নিজেদের ঘর সংলগ্ন বেদীতে এসে বসেন ভক্তদের দর্শন দিতে। ছাই মাখা, চিমটে হাতে এই সব জনা পঞ্চাশেক সাধুদের মধ্যে মাত্র দুচারজনকে নগ্ন দেখলাম। বাকীসব গেরুয়া ধারী।

আমি এখন হেল্থ ডিপার্টমেন্ট এর একজন ভলান্টিয়ার। সকাল থেকে অ্যাডভান্স টীমের সবাই নির্দিস্ট কাজে ব্যাস্ত। আর আমি সব কাজেই আছি আবার কোন কাজেই নেই। ঝাড়া হাত পা। সারাদিন কেবল চক্কর কাটা মেলা গ্রাউন্ড এর এ প্রান্ত থেকেও প্রান্ত। আমার জামাই বাবু বাজাড়ু মানুষ। ওর সঙ্গে ভোর ভোর মাছের বাজার যাওয়া, সেখান থেকে প্রায় জ্যান্ত ছোট ছোট পাবদা, ভেটকি, পারসে মাছ কেনা, সে এক মজার অভিজ্ঞতা। মাছের দাম শুনে আমাদের মতো ড্যমচী বাবু দের সে কি আনন্দ। আর সেই টাটকা মাছ এক এক রকমে পদ—ঝোল, ঝাল আমাদের রেগুলার পিকনিক এক্কেবারে জমিয়ে দিল। ধীরে ধীরে রোজ একটু একটু করে মেলার লোক সমাগম বাড়তে লাগল। কিছু টুরিস্ট বা ভক্তদের আসা যাওয়া মাসের প্রথম থেকে চলতে থাকত। কপিলমুনীর মন্দিরের ঠিক পাশ থেকে শুরু নাগা সাধুদের লম্বা ক্যাম্প। ভক্তরা মন্দিরে পূজো দিয়ে তারপর সাধুদর্শন করেন, আশীর্বাদ নেন। যত বেলা বাড়ে সাধুসঙ্গের অনেক নতুন নতুন ভক্তদের আবির্ভাব হয়। সন্ধ্যার পর এই ছাউনি গুলো র আলাদা আর এক রুপ, গাঁজার গন্ধে ভরপুর, চারিদিকে শুধুই কাঠের আগুন আর ধোঁয়া। কিছু কিছু ভক্ত বা আমাদের মতো কাজে আসা লোকেরা ও জুটে যান ওই ধর্মযজ্ঞে। এই সব সাধুরা কেউ পুরোনো সাংসারিক স্মৃতির কথা বলতে চান না। মজা হল, যত মকর সংক্রান্তির দিন এগিয়ে আসে, নিজেদের বস্ত্রত্যাগ করে নাঙ্গা রুপ ধারন করেন। আর কত রকম বিসদৃশ কসরৎ দেখান সাধুরা নাঙ্গা অবস্থায়।

আমরা একদিন গঙ্গা স্নান করতে গেলাম। বেশ উঁচু ঢেউ। ওমা! স্নান করতে গিয়ে দেখি জলের রঙ সে কি কালো ও ঘোলা। দূষণের জন্য সে কি দুর্দশা। একবার এই জলে স্নান করলে মনে হয় আবার ভালো জলে স্নান করতে হবে। নাক, মুখ বন্ধ করে কোনমতে ডুব। সারা দেশের পাপ ধোয়া জল তো।, তাই এই দূরবস্থা। এই জলে স্নান করে আবার নাকি স্বর্গলাভ হবে। আমি ওই দিন ষোল থাকার মধ্যে মাত্র চার পাঁচ দিন স্নান করেছিলাম, আর মকর সংক্রান্তির ভোরের মহেন্দ্র ক্ষণকে বাদ দিয়ে।

সাগরের ওপর এক গরুর ল্যাজ ধরে কত ভক্ত যে বৈতরণী পার হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। যত মকর সংক্রান্তি এগিয়ে আসছিল, মেলা যেন জনসমুদ্রের চেহারা নিচ্ছিল। এই মেলার সময় লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রাশন সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেঁধে দেন। মেলায় কত রকমের জিনিস যে বিক্রি হয় তা কি বলব। শহর থেকে দলে দলে ভিখিরীর সাপ্লাই হয়। অন্ধ, বিকলাঙ্গের সাপ্লাই হয়। হিজড়ে, গণিকাদেরও সাপ্লাই হয়। গঙ্গাসাগর যেন মিনি ভারতের প্রতিরূপ। হাজারে হাজারে আবাল বৃদ্ধ বণিতা এই তীর্থে এসে লীন হয়। ভারতের কোন সুদূর রাজ্যের পুটুলীসম্বল মানুষ এই তীর্থে এসে যেন জীবনের আশা আকাঙ্খা সার্থক করতে চায়। সেই সময় মেলা গ্রাউন্ডে কোন থাকার জায়গা না পেয়ে অনেকেই হোগলা পাতার ছাউনী মতন ছাতা মাথায় দিয়েই রাত কাটান। এমনও দেখেছিলাম যে, কত যে মহিলা, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা এই তীর্থে এসে দলছাড়া হয়ে যায়। এমন দেখেছি বৃদ্ধ মা, বাবা তীর্থে এসে ফেলে রেখে যায় আত্মীয় পরিজন। একটি বড় অস্থায়ী শিবির থেকে মাইকে তারস্বরে ঘোষণা চলে এই সব নিরুদ্দিস্টদের ফিরিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে। বৃদ্ধ, বৃদ্ধারা অনেক সময় নিজেরা মাইকে কেঁদেকেটে আত্মীয় দের ডেকে চলেছে। দলছুট অবাঙালী দেহাতী মেয়ে বা বউ শুধুই কেঁদে চলেছে, জানিনা তার ভবিষ্যত তাকে কোথায় নিয়ে দাঁড় করাবে। কেউ ফিরে যেতে পারবেন, কেউবা পারবেন না। গঙ্গাসাগরের এমনই দস্তুর।

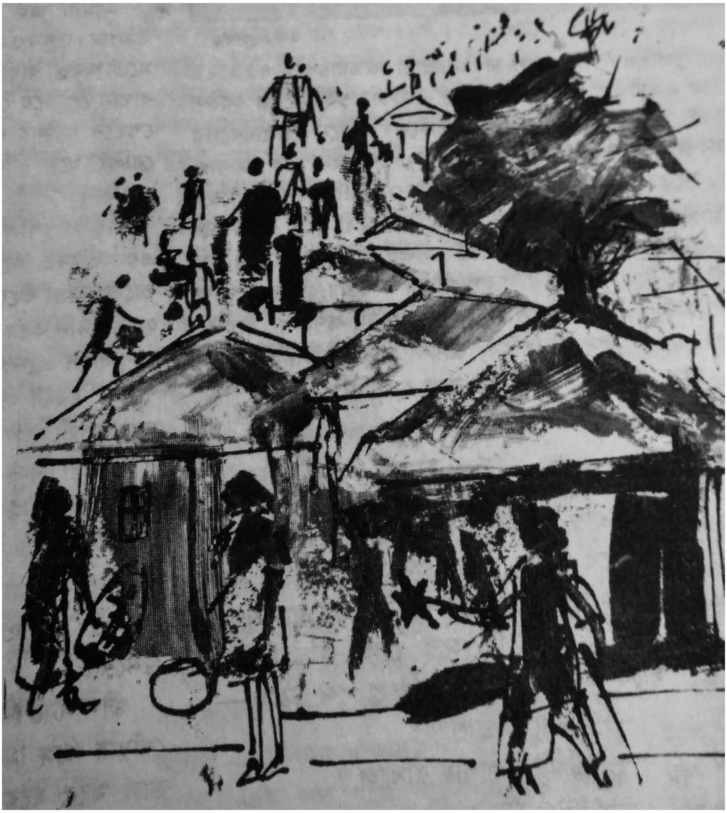

বেশ মজা লাগে হোগলা পাতায় মোড়া অস্থায়ী থানা, লক আপ, জেল খানা দেখে। চোর, পকেটমার, ছিনতাই বাজ তো অনেক আসে, ধরা পড়লে পুলিশ কোমরে দড়ি বেঁধে লক আপে নিয়ে যায়।

আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের হসপিটালে আস্তে আস্তে স্টাফও বাড়তে লাগল। অনেক ডাক্তার, নার্স যোগ দিলেন। অনেক বয়স্ক লোক অসুস্থ হয়ে আউটডোরে দেখিয়ে সুস্থ হচ্ছেন। জামাইবাবুর তো দম ফেলার সময় নেই, মেলার স্বাস্থ্য সচেতনতার, বিক্রি খাদ্য ইনস্পেকটরের কাজ, সদাই ব্যাস্ত। আমাদের দেখলে বিভিন্ন সংস্থার লোকজন বেশ সমীহ করে চলে। আমার তো বেশ একটা "ফিলিং ফিলিং" ভাব। কোন কোন ধর্মীয় মঠ আবার এক একদিন প্রসাদ খাওয়ার নিমন্ত্রণ করল।

মেলার অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার বড় বড় শিবির হয়েছিল। তীর্থযাত্রীদের কেউ শুধু লুচি হালুয়া, আবার কেউবা খিঁচুড়ী, আবার পাহাড়প্রমাণ নকুলদানা, বাতাসা দিচ্ছেন কেউবা—এযেন এক প্রতিযোগিতা চলছে উদ্দোক্তাদের মধ্যে।

সে বছর সবই বেশ ছন্দে চলছিল। কিন্তু ছন্দপতন হল মকর সংক্রান্তির দিনই। রাণী সতী নামে রাজস্থানী সংস্থার শিবিরে পুরী, সবজীর আয়োজন ছিল। পুরী ভাজা হচ্ছিল বড়. বড় কড়াইয়ে। সেই থেকে টেন্টের মাথার ত্রিপলে আগুন লাগল। মুহূর্তের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ল আসে পাসের আরও কটি ছাউনি তে। সেই সময় চার নম্বর রাস্তা দিয়ে লক্ষ মানুষের ঢল। সবাই মকর সংক্রান্তির স্নান সেরে ফিরছেন। পুলিশ, প্রশাসন দ্রুত ব্যাবস্থা নিয়ে রাস্তা ঘুরিয়ে দিল। দমকলের অ্যাকশনে আগুন বেশী ছড়াতে পারে নি। আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের হসপিটালে তখন চরম তৎপরতা, আমি নেমে পড়েছি বুকে ব্যাজ লাগিয়ে। একের পর আগুনে পোড়া, ঝলসানো রোগীকে আনা হচ্ছিল। তা জনা চল্লিশ, পঞ্চাশেক তো হবেই। আমারা সবাই নেমে পড়েছি জোর কদমে, মানুষের প্রাণের টানে। বারনল, ব্যান্ডেজেও টান পড়ল এমন নিদারুন সময়ে,। কলকাতায় খবর পাঠানো হচ্ছে আরও বার্ণ ওয়ার্ডের সরঞ্জাম এর জন্য। আবার বেশ কিছু আহতদের ডায়মন্ডহারবার রুরাল হাসপাতালে পাঠানো হল। মনে আছে আমার মতো ভবঘুরেও তখন পুরোদস্তুর স্বাস্থ্য কর্মী। চারিদিকে শুধুই হাহাকার। আমি ভাবতেই পারি নি কখনো যে এই সব আহত, দুস্থ, সন্ত্রস্ত তীর্থযাত্রীদের সাহায্যে আমি আসব।, তবুও এই স্বান্তনা যে, সময় মতো ব্যাবস্থা নেওয়ায়, পদপিষ্ট হয়ে লোক মারা যায় নি। তবে জনা সাতেক তো আগুনে পুড়ে মারা গেল। তাদের বডিগুলো হাসপাতালে পড়ে ছিল অনেক ক্ষণ। সাগরসঙ্গমে এসে যে এমন অভিজ্ঞতা হবে স্বপ্নেও ভাবিনি। যাই হোক, সংক্রান্তি শেষে মানুষের ঢল ঘরে ফেরার জন্য। আমাদের আরও দুদিন ওই আহতদের সঙ্গে থাকতে হল।

ভাঙ্গা মেলায়, ভারাক্রান্ত মনে দুদিন আরও কাটাতে হল। হেল্থ কর্মী দের একটি রিচুয়াল আছে পুরো টীমটা ভেঙ্গে যে যার বাড়ি চলে যাবার আগের রাতে একটু আনন্দ, মজা করে “বন ফায়ার” করার। আমরা সেই শীতের রাতে আগুন জ্বালিয়ে একটু অন্যরকম খাওয়া দাওয়ার ব্যাবস্থা করলাম।

সেই যে অচেনা, অজানার আনন্দ ও উত্তেজনা নিয়ে আমার গঙ্গা সাগর সফর শুরু হয়েছিল, তা যেন এক বিষাদে শেষ হল।

গঙ্গা সাগরের দিনগুলিতে আমি আমার আগফা ক্যামেরায় যে সব ছবি গুলো তুলেছিলাম, পরে ওয়াস করার সময় সেই সবই কেন যেন নষ্ট হয়ে যায়। তবে জণগণের সঙ্গে সুখে, দুঃখে, আবেগ, অনুরাগে জড়িয়ে আমি যে সব উপলখন্ড কুঁড়িয়ে এনেছিলাম সেই দিনগুলিতে, তা আমার সারা জীবনের পাথেয় হয়ে রইল। চোখের ক্যামেরায় ধরা এক একটি স্ন্যাপ যেন আজও স্মৃতির ফ্রেমে অমলিন॥

You've Just Finished your Free Sample

Enjoyed the preview?

Buy: https://store.prowesspub.com